‘শিল্প বোঝার কিছু নেই, শিল্প অভিজ্ঞতা করার বিষয়’

শিল্পী **সঞ্চয়ন ঘোষের** সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **পৌষালী ঘোষ**।

নিজেকে ‘ক্রিটিক্যাল পেন্টার’ বলে মনেই করেন না, শিল্পকে একটি ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার বলে চিহ্নিত করতে চান না, আলাদাভাবে প্রজেক্টেড হতে চান না বলে স্যোসাল মিডিয়াতেও কোনো প্রোফাইল পিকচার দেন না। সাক্ষাৎকারের সময় যথেচ্ছ ইংরাজি শব্দ ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে নেন। শিল্পচর্চা তাঁর কাছে সাংস্কৃতিক চর্চার একটা অংশ। ইদানীংকালে কাজের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইনস্টলেশন আর্ট। গ্যালারি এক্সপেরিমেন্টর-এ ডিসেম্বর ২০১৫-তে প্রদর্শিত হয়েছে – প্রমিসড্ ল্যান্ড – An art project of Kharia’s china clay factory hopes to usher in much delayed change. কী খান, কী পরেন, অবসর সময়ে কী করেন জাতীয় প্রশ্নের বদলে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে এমন প্রশ্ন যার উত্তরে আলোচনা গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত একটা প্রবন্ধের আকার পেল সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার শেষে সঞ্চয়ন ঘোষের প্রশ্ন ‘বেশি হাইপোথেটিক হয়ে গেল না তো?’

সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে পাশ করে কলাভবন – কলাভবনের ছাত্র এবং বর্তমানে শিক্ষক। নিজের সম্পর্কে এইটুকুর বেশি তথ্য সরবরাহে নারাজ। বয়স চল্লিশের আশেপাশে। বিবাহিত। থিয়েটারের সঙ্গে সংযোগ দীর্ঘদিনের। মঞ্চ-শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন, করছেন; তবু বলেন ‘কলকাতা থিয়েটারে আমি তো বহিরাগত’।

পৌষালী : মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের ঘরে ঘরে ছবি-ভাস্কর্যের চর্চাকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্ভাসের জন্ম ২০০৪ সালে। আমার প্রশ্ন শিল্পকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমনটা আদৌ তুমি মনে করো কি?

সঞ্চয়ন: প্রথমত যে মুহূর্তে ভাবছি শিল্পকে পৌঁছে দিতে হবে সেই মুহূর্তে শিল্প একটা ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। আমার কাছে তা নয়। আসলে কতগুলো প্রতিষ্ঠান শিল্পের কতগুলো ভূমিকা, কতকটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে দিয়েছেন যার মধ্যে তাঁরা নিজেরাও জানেন না সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলো কতটা ঠিক, কতটা ভারতবর্ষের শিল্পচর্চার মধ্যে ছিল ... এভাবে কতগুলো পাকচক্র তাঁরা নিজেরা তৈরি করেছেন যার থেকে নিজেরাও বেরোতে পারছেন না।

শিল্পচর্চা আসলে সাংস্কৃতিক চর্চার একটা অংশ, এটা প্রথমে মেনে নেওয়া ভালো। যদি কেউ মনে করেন শিল্পচর্চা আর সাংস্কৃতিকচর্চা আলাদা জিনিস তাহলে আমি সেই দলে বিশ্বাসী নই। আর শিল্প যদি সাংস্কৃতিক চর্চারই বিষয় হয় তাহলে শিল্প

মানুষের জীবন থেকেই উঠে আসে। মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয়তার জন্যই শিল্পের অস্তিত্ব, মানুষ ছাড়া শিল্পের অস্তিত্ব নেই। তাহলে নিয়ে যাওয়া – নিয়ে আসার প্রশ্নটাও থাকে না। কিন্তু কতকগুলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার কারণে এই প্রশ্ন উঠছে যে শিল্প মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। এর জন্য শিল্পীরাই দায়ী, 'শিল্পী' নামক প্রতিষ্ঠান দায়ী।

ধরো আমরা যখন একটা মন্দির-গির্জা দেখতে যাই তখন আমাদের কাছে বিষয়টা শিল্প হিসেবে নয় অভিজ্ঞতা হিসেবে আসে। তখন আমরা আর আলাদা করে চিত্রকলা, ভাস্কর্য কিংবা আর্কিটেক্চার দেখি না। একটা ইন্টিগ্রেটেট রিলেশনশিপের মধ্য দিয়ে একটা স্পেসিফিক কোনো মতাদর্শ বা আইডিয়া বা কোনো বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে একটা ফর্ম-এর একজিস্টকে অভিজ্ঞতা করি।

এবার আমাদের যে জীবনচর্চা, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন – রাজতন্ত্র থেকে আমরা নগরায়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম্, পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম্-এর মধ্যে ঢুকে পড়েছি – যেখানে অন্য প্র্যাকটিসের মতো শিল্পের মধ্যেও বহু ফ্র্যাগমেন্টেশন এসেছে। ব্যক্তি শিল্পী বলে একটা বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতাও বহু ফ্র্যাগমেন্টে ভেঙে যাচ্ছে। শিল্পীর ব্যক্তিসত্ত্বার উদ্ভব হচ্ছে। ব্যক্তি স্বীকৃতি তাকে ব্যক্তিমুখী করছে। শিল্প বলে একটা জিনিস যেটা সংস্কৃতি থেকে আলাদা হয়েছিল। একটা এসথেটিক অবজেক্ট হিসেবে শিল্পের উদয় হয়েছিল। এটার প্রয়োজনীয়তা একটা সময় পর্যন্ত ছিল – ব্যক্তি শিল্পীর কোনো আলাদা সত্ত্বা তৈরি হচ্ছিল না মন্দির-গির্জার মধ্যে। সেই প্রয়োজনীয়তা একটা স্তরে গিয়ে এক্সট্রিম লেবেলে গেল – শিল্পের জন্য শিল্পের সৃষ্টি হতে লাগলো। তাঁরা হয়তো সমাজের কোনো প্রতিক্রিয়াতেই কাজ করলেন, কিন্তু সমাজের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ রাখলেন না – প্রতিক্রিয়াটা প্রতিক্রিয়াভিত্তিক হয়ে গেল – আর্ট গেভ বার্থ টু আর্ট ইটসেলফ্। প্রতিদিনের মানুষের যে জীবনচর্চা, শিল্পটা তার থেকে আলাদা হয়ে একটা স্পেশালাইজড সেপারেট সিস্টেম হিসেবে আবির্ভূত হল। সারকুলেশন বা শেয়ারিং সিস্টেমটা একটা নির্দিষ্ট সার্কেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং একটা প্রথাগত ধারণা হয়ে গেছে যে শিল্পকে বুঝতে গেলে শিল্প শিখতে হয়।

শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কী? কিংবা শিল্পীর সামাজিক অবস্থান কী? এই কথাগুলো প্রসঙ্গত আসা উচিত। আগে একজন পটুয়া যখন ছবি আঁকতেন তার উপার্জন তিনি জানতেন, কী করে মার্কেট করতে হবে তিনি জানতেন, কাদের কাছে থেকে পয়সা

পাওয়া যাবে জানতেন – কীভাবে শেয়ার করলে একজিসটেন্স থাকবে জানতেন। সেটা করতে গিয়ে তিনি একটা ইনটিগ্রেটেড ভাষা আবিষ্কার করেন যেখানে সুর এবং ভাষা একসঙ্গে শেয়ার করা হচ্ছে। কিন্তু আজকের দিনের পটুয়ারা গান বন্ধ করে দিয়েছেন, চিত্রশিল্পী হয়ে গেছেন এবং এই বিচ্ছিন্নতা সমসাময়িক শিল্পীদের ক্ষেত্রেও এসেছে। তিনি নিজেও জানেন না কার জন্য ছবি আঁকছেন, কোথায় আঁকছেন, কাকে দেখাবেন, কীভাবে দেখাবেন, কাকে শেয়ার করছেন। এখন চিত্রশিল্প ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এইরকম যে তা কতকগুলো এসথেটিক নর্ম সার্ভ করছে কি না এবং তারপর তারমধ্যে আটকে থেকে লিমিটেড সার্কিটের মধ্যে সেটা অপারেট করছে। আমরা প্রসেসটা শেয়ার করছি না কেবল এন্ড প্রোডাক্টটা শেয়ার করছি। কিন্তু গ্রামের মধ্যে পটুয়ার ছবি আঁকা সবাই দেখছে জানছে তার মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড রিলেশনশিপ বিটুইন ভিয়্যুর এন্ড দ্য মেকার এটা ছিল। এখন অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক, সার্কল ওরিয়েন্টেড – যার ফলে আমাদের মনে হয় শিল্পী বলে একটা আলাদা জিনিস এবং সেটাকে অ্যাকোয়ার করতে হয় – এটা আসলে শিল্প প্রক্রিয়ারই বিচ্ছিন্নতা, শিল্পীরা সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের প্রক্রিয়াটাকে যুক্ত রাখতে পারেনি।

পৌষালী : শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারো?

সঞ্চয়ন: দেখো, আমি ইনস্টিটিউশনের অংশ – তবে শান্তিনিকেতনে এই প্র্যাকটিশটা চিরকালই ছিল যে চারপাশের মানুষজন, পরিমণ্ডল পরিবেশ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে একটা সাংস্কৃতিক চর্চায় যাওয়া। তাই এখানে ম্যুরাল প্র্যাকটিস, আউটডোর স্কাল্পচার প্র্যাকটিস শুরু হয়েছিল সেই সঙ্গে স্টুডিও প্র্যাকটিসটাও ছিল। এই যে একজন শিল্পী দুটো লেভেলে অপারেট করছে – একটা পাবলিক স্ফিয়ারে আর একটা প্রাইভেট স্ফিয়ারে – এটার কারণই হচ্ছে ভিতর আর বাইরের সম্পর্কটাকে বজায় রাখা।

এবার আবারও সেই প্রশ্নটা আসে – প্রয়োজনীয়তা, কাজ। শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কী? সাধারণভাবে যে জীবনচর্চা, তার যে মূল্যবোধ, তার যে ভ্যালু সিস্টেম, তার যে এন্টারটেনমেন্ট তার সাপ্লাই না কি একটা ক্রিটিক্যালিটি তৈরি করা? আমি যে

সময়ে বাস করি সেই সময়ের সাপেক্ষে একটা সচেতন ফ্রি স্পেসকে আমি জন্ম দিতে পারছি না কি গোটাটাই একটা বিনোদনের মধ্যে আটকে থাকছে। সমস্যাটা কিছু লোকের কাছে ব্যক্তিগত, কারো কাছে মতাদর্শগত। কিছু কিছু লোক নিজের ভিউয়ার খুঁজে নিয়ে সেই সার্কেলের মধ্যে থাকতেই ভালোবাসে। এই ক্রিটিক্যালিটির যে ডোমেন – তার বাইরে গেলে দেখবো ভিস্যুয়াল কালচার অনেক বেশি অ্যাকটিভ, ইন্টারনেটের যুগে ছবি দেখার অভ্যাস বেড়ে গেছে কিন্তু শিল্পবোধ বেড়ে গেল কি? উৎপাদন বেড়ে গেছে, অ্যাভেলেবেলিটি বেড়ে গেছে – যা পাচ্ছি তাই নিচ্ছি।

রিসেন্টলি যেটা হয়েছে – রেলওয়ে মিনিস্ট্রি থেকে সমস্ত স্টেশনগুলোতে ম্যুরাল প্রজেক্ট হবে। কাজের দায়িত্ব একজনও শিল্পী পাননি – পেয়েছেন কিছু বিল্ডার্স। এর মধ্যে শান্তিনিকেতন আছে। তিনি নেটে সার্চ দিলেন – কিছু ছবি পেলেন – ডাউনলোড করে –ডিজাইনারদের দিয়ে দিলেন – নিজে একবার কলাভবন গেলেনও না – অর্ধেক রবীন্দ্রনাথ, অর্ধেক কে.জি. সুব্রামানিয়াম জুড়ে শান্তিনিকেতন হয়ে গেল। গ্লোবালাইজেশন-এর যুগে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ভালো খারাপের চেয়েও কোনটা অ্যাভেলেবল – তা দিয়ে কত সস্তায় আমি কত কী করতে পারি। এই চ্যালেঞ্জটা শিল্পীরা নেবেন কি না কিংবা চ্যালেঞ্জ নিতে গিয়ে নিজেরাই ঘুরে ফিরে বাজারি হয়ে পড়বেন কি না এই জাতীয় সমস্যা থেকেই যায় যেহেতু শিল্পীরা কোনো আলাদা প্রজাতি নয় সামাজিক বস্তু।

এ জাতীয় ক্রাইসিস বিশ্বজুড়েই আছে। এখানে শিল্পচর্চা আর শিক্ষাচর্চাটার মধ্যে বিস্তর গ্যাপ থাকার ফলে শিক্ষাচর্চা থেকে যেটুকু শিল্পচর্চা শিখে এসেছে তাদের হাতে অনেক দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি শিল্পচর্চা সম্পন্ন প্রকৃত মানুষের জন্য বেশি মূল্য দিতে না হয়। তাই স্কুলে চিত্রশিল্পের ইতিহাস পড়ানোর জন্য আর্ট হিস্ট্রির শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। আসলে সিলেবাস তৈরি করেন যারা তাঁদের এই বোধটা আছে যে শিল্পচর্চার ইতিহাস জানা দরকার, কিন্তু প্রয়োগের জায়গায় গোলমাল আছে। আমি যদি ইতিহাসটা জানি তাহলে একটা লেভেল পর্যন্ত আমি শিল্পচর্চাকে অন্য চোখে দেখবো, কিন্তু তারপর বলবো এরপর আমি ‘বুঝি না’। এটা প্রথমত বুঝতে হবে শিল্প বোঝার কিছু নেই, শিল্প অভিজ্ঞতা করার বিষয়। শিল্প ইজ নট লিটারেচার যে পড়ে বুঝতে হবে। আর্ট ইজ নট ইনফরমেশন। পাশাপাশি আর একটা কথাও মেনে নেওয়া ভালো যে ডিজিট্যাল এজে সবকিছুই ইমেজ, মেটিরিয়াল নয়। এভরিথিং ইজ ফ্ল্যাটেন, ওয়ান সারফেস। তাই রক্ত রক্ত থাকে না, রঙ হয়ে যায়, ইমেজ হয়ে যায়। আমরা এমন একটা সময়ে পৌঁছেছি যখন সারফেসের ভ্যালু আর কোনো রেলিভ্যান্স রাখে না – সবটাই ওয়ান সারফেস হয়ে গেছে। আর আমরা ডিজিট্যাল দুনিয়া নিয়ে এতটাই বম্বার্ড যে ফিজিক্যালি দেখলে আর রিয়াক্টই করি না।

পৌষালী : এটা কি তোমার ছবি আঁকা ছেড়ে দেওয়ার কারণ?

সঞ্চয়ন: না না, এটা একটা ভুল ধারণা যে যারা ইনস্টলেশন করে তারা ছবি আঁকে না বা আঁকতে ভালোবাসে না। আসলে এখানে একটা বিভাজন করে দেবার চেষ্টা। ইনস্টলেশন আর্ট একটা ইন্টিগ্রেটেড প্র্যাকটিস। যেখানে একটা ইমেজ বিভিন্ন ধরণের পন্থার মাধ্যমে একটা জায়গায় আসার চেষ্টা করছে আবার নতুন করে। যেটা বিভাজিত হয়ে গেছে সেটাকে আবার নতুন করে দেখার চেষ্টা করছি। থিয়েটার আছে, ভিস্যুয়াল আর্টের বিভিন্ন মাধ্যম আছে – ইন্টিগ্রেটেট রিলেশনশিপটা এর মূল উদ্দেশ্য। পৃথক বস্তুগুলো নয়।

চিত্রশিল্প সবসময়ই একটা এন্ড প্রোডাক্ট হিসেবে আসে। এইটায় আমার একটা ব্যক্তিগত সমস্যা হচ্ছিল। আমি এন্ড প্রোডাক্ট এবং এর হয়ে ওঠার প্রসেসটা শেয়ার করতে চাইছি। ইনস্টলেশনকে আমি আর্ট ফর্ম হিসেবে দেখিই না। ওটা একটা আইডিওলজি।

পৌষালী : যাপনের মাধ্যম বলা যায়?

সঞ্চয়ন: না, আমার 'মাধ্যম' শব্দটাতে আপত্তি। জীবনচর্চার মধ্যে শিল্পকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া – সেটাই ইনস্টলেশন।

পৌষালী : রাস্তাঘাটে যা হচ্ছে –

সঞ্চয়ন: তার মধ্যে ইনস্টলেশনের গুণ আছে। সেটাকে পরিবেশনের স্তরে নিয়ে যাওয়া – প্রতিদিনের জীবনচর্চাটাকে শিল্প প্রক্রিয়া হিসেবে শেয়ার করাই ইনস্টলেশন। যে কোনো মাধ্যমই শৈল্পিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

পৌষালী : জটিল ...

সঞ্চয়ন: জটিল নয় – আসলে খুবই সহজ। কিন্তু আমাদের চর্চাটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যেটা আমাদের স্বীকার করে নিতে অসুবিধা হয় যে এতটাই সহজ। শিল্পের

কাজই তো তাই – মেমরিকে ইনস্টিগ্রেট করা। নিউ মেমরি থ্রু নিউ রিলেশনশিপ। আমরা সেটাকেই শিল্প বলি যেটা আমার অ্যাবসেন্সে আবার ফিরে আসে।

পৌষালী : তুমি শিল্পী, তুমি শিক্ষক – দুটো সত্ত্বাকে কীভাবে মেলাও বা পার্থক্য করো?
সঞ্চয়ন: আমার কাছে শিল্পচর্চা আর শিক্ষাচর্চা আলাদা নয়। শিক্ষকতা মানে আমার কাছে জ্ঞান দেওয়া নয়, জ্ঞান অর্জনও। আমি যখন আমার ১৫জন ছাত্রের কাছে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি সেটা যেমন ইম্পর্টেন্ট তেমনি আননোন ভিউয়ারদের কাছে শেয়ার করছি সেটাও। তারা সেটা রিসিভ করবে কি না – সেটা ডায়ালগের মধ্যে নিয়ে যেতে পারছে কি না – আমার কাছে পেডাগজি আর আর্ট প্র্যাকটিস একটা কয়েন-এরই দুটো দিক। আমি এভাবেই দেখি।

পৌষালী : তোমার বিদেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা যদি একটু শেয়ার করো।
সঞ্চয়ন: বিদেশে কাজ করি চেনা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে কাজ করার জন্য। একেবারে আননোন ভিউয়ারদের শেয়ার করতে পারছি কি না – এই আর কী? আর্ট অ্যাজ এ প্রসেস অফ কমিউনিটি শেয়ারিং। এখানে বিদেশ বলে কিছু নেই – চেনা গণ্ডীর বাইরে হলেই হল। আমার কাছে আর্ট মেকিংটা একটা পার্টিসিপেটারি প্রসেস। সেল্ফ ইনক্লুসিভ প্রসেস নয়, আমি কীভাবে নিজেকে যুক্ত করছি সেখান থেকে শিল্পের জন্ম। সেটা একটা কারণ হতে পারে কেন আমি এখন স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকি না। আমি এখন আর একা আর্ট ওয়ার্ক তৈরির কথা ভাবতে পারি না। আমার একটা স্পেস জেনারেট হওয়া দরকার যেখান থেকে একটা কিছু তৈরি হবে – এই ধরণের চর্চায় ঢুকে পড়েছি। সেটাকে অবশ্য কেউ শিল্প নাও বলতে পারেন।

পৌষালী : তোমার এই ধরণের কাজে কি তথাকথিত শিল্পীরাই সঙ্গী হন?
সঞ্চয়ন: না, আমি তাঁদের অ্যাভোয়েড করি। তাঁদের এত ব্যাগেজ থাকে যে – ব্যক্তিচিহ্ন তৈরি হল কি না, কী লাভ হল, কী রিটার্ন পেলাম ইত্যাদি অসুবিধা হয়।

পৌষালী : রিসেন্ট কাজ –
সঞ্চয়ন: রিসেন্টলি একটা কাজ শেষ করলাম। দশ বছরের কাজ। এভাবেই এখন ভাবছি আমি – প্রক্রিয়া হিসেবে। এটা ছিল একেবারেই পেডাগজিক প্রজেক্ট। গত দশ বছর ধরে যারা মাস্টার ডিগ্রি পাশ করে বেরোচ্ছেন তাদের সঙ্গে কথোপকথন, এই অ্যাকাডেমিক স্পেসের এক্সপিরিয়েন্স আর বাইরের বৃহত্তর জগৎ – তার কমপ্লেক্স ইস্যুস, সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা। যখন আলাপ চলছে তাদের ওপরে একটা

আলো ফেলা হচ্ছে, সেই আলোর কারণে ছায়াটা একটা ফটোসেনসেটিভ স্ক্রীনে এক্সপোজ করা হচ্ছে আর তারপর সেটা জল দিয়ে ধুলে ছায়ার অংশটা ধুয়ে যায়। সেটা একটা অ্যাবসেন্ট হিসেবে ডকুমেন্টেট হয়। আমার কাছে এটা একটা পেডাগজিক ইন্টারভেনসন – যে একটা একাডেমিক স্পেস থেকে বহু ছাত্র অনেক আইডিয়া নিয়ে বেরিয়ে যায় – তাদের কোনো প্রেজেন্ট থাকে না। অ্যাকাডেমিক্স তার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে ইরেজ করে যায়, ভ্যানিস করে যায় – এইটাকে একটা ডায়ালগ হিসেবে রাখা আর কী! দশ বছরের স্প্যানে আট বছর ধরে প্রতি বছর ত্রিশ চল্লিশজন স্টুডেন্ট অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষকতার প্রসেসও চলছে আবার ডায়ালগ চলছে, সোসাল স্পেস জেনারেটেড হচ্ছে, কমিউনিটি তৈরি হচ্ছে। এরপর আমি ফেসবুকে একটা গ্রুপ ফর্ম করলাম – মার্জ-ইমার্জ। কিছু ছবি পোস্ট করে বললাম তোমরা বলো এবার এটা কী করা হবে। কেউ বলল ধুয়ে ফেলুন, কেউ বলল রেখে দিন, কেউ বলল ডিসপ্লে করুন তারপর যদি রেখে দেওয়া যায়! যারা ধুয়ে ফেলতে বলেছে তাদের এটা পরিষ্কার করে বলা হল নিজেদের এসে সেটা করতে হবে। তারপর ২০১৫ সালের নন্দনমেলায় প্রায় ১৫০টা স্ক্রীন দিয়ে একটা স্থাপত্যের মতো করা হয়েছিল কলেজ বিল্ডিং-এর এক্সটেনসন – আর বিল্ডিং-এর দেওয়ালে ছোটো ছোটো ভিডিও-তে কথোপকথনগুলো লাগানো ছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে এটা করে কী হল? এবার শিল্পের উদ্দেশ্য কিন্তু ডেভলপমেন্টাল মেথডোলজি নয় – একটা ভিন্ন ধরণের স্পেস-এর ভিজিবিলিটি তৈরি করা পর্যন্ত শিল্পের প্রয়োজনীয়তা। তারপর অন্য কেউ সেটাকে এগিয়ে নিতে পারেন – কিন্তু ডেফিনিট একটা আউটকাম যে আসবেই এটা শিল্পের প্রয়োজনীয়তা নয় বা চাহিদাও নয়।

পৌষালী : ভালো বা মন্দ শিল্পের দ্বন্দ্ব বিষয়টা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

সঞ্চয়ন: বিষয়টা তাত্ত্বিক। অনুভূতির প্রশ্ন। শিল্পের অভিব্যক্তি বা গুণাবলী আসলে ব্যক্তির ঐ সময়ের মানসিকতার ওপর নির্ভরশীল।

পৌষালী : থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক আর সংযোগ-এর কথা একটু বলো।

সঞ্চয়ন: মঞ্চ শিল্পী হিসেবে এসেছিলাম এই ইন্টিগ্রেটেড প্র্যাকটিসের সঙ্গে পারফরম্যান্সের আদান প্রদান হবে এই ভাবনা থেকে। তিন বছর বাদল সরকারের সঙ্গে কাজ করেছি। এটা অনেকটা ভাস্কর্য ভিত্তিক। প্রসেনিয়াম-এ অনেকটা পিক্টোরিয়াল। আমি দুটো স্পেসেই অপারেট করেছি। যেহেতু থিয়েটার টেম্পোরারি ভাষা তাই আমার কাছে ইন্টারেস্টিং ছিল। পারফরমেন্সের সঙ্গে ডায়ালগ করাটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল অনেক ক্ষেত্রেই ভিস্যুয়ালটা ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে রয়ে যাচ্ছে –

ব্যাকগ্রাউন্ডের বাইরে পারফরমারের বডির সঙ্গে ডিজাইনিং-এর কোনো সম্পর্ক তৈরি করা যায় কি না –

পৌষালী : শানু রায় চৌধুরী ...?

সঞ্চয়ন: হ্যাঁ, শানুতে যেটা জাল – ওটা জাল না দেওয়াল না কাপড় না বডি – এটা নিয়ে চেষ্টা – আসলে কোনো বস্তুকে যা দেখছি তার বাইরে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা আর কী!

পৌষালী : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

সঞ্চয়ন: আমি পেডাগজিক স্পেসের মধ্যে থেকেই কাজ করতে চাই। প্রাতিষ্ঠানিকতার ভিতরে থেকেই বাইরেটার পরিবর্তন করতে চাই। শুধু ব্যতিক্রমী বলে দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে আমি নই। বিকল্প একটা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান দিতে না পারলে এই ব্যতিক্রম অর্থহীন।

এমনিতেই শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা ভালো নয়, তবে তাঁরা সামাজিকভাবে যুক্ত হতে চাইলে সাপোর্ট সিস্টেম আছে। এই যে আমাদের প্রথাগত ধারণা যে আগে শিল্প তৈরি করি তারপর বাজারে গিয়ে দাঁড়াবো এবং বাজারে বিবেচনা হবে আমার শিল্প বিক্রি হবে কি না! এর বাইরে যদি শিল্পীরা সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠানে, তাদের কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন তাহলে কাজের সুযোগ আছে।

আনফরচুনেটলি আমাদের এখানে দুর্গাপুজোয় অনেক টাকা এক্সস্টেট হয়ে যায়। পুজোতে হয়তো বিনোদন হয়। বহু শিল্পীর কাজ করার জায়গা হয়, বহু ধরণের চর্চারও অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে সামাজিক কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা নিছকই পাঁচদিনের বিনোদন। সেটা না মানুষের মধ্যে কোনো প্রশ্ন তৈরি করে, না মানুষের অস্তিত্ব, অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাদা কোনো সচেতনতা তৈরি করে। এটা সাময়িক বিনোদনের জায়গাতেই আটকে থাকে। সর্বজনীন পুজো – সব কিছু সর্বজনীন করে দিয়ে ভিড়ের মাঝখানে হারিয়ে ফেলে। আর শিল্পের উদ্দেশ্য যদি ভিড়ের মাঝখানে সবকিছু হারিয়ে দেওয়া হয় সেটাতে আমি খুব একটা বিশ্বাসী নই। আমার মনে হয় যে ধর্মীয় রিচ্যুয়ালের বাইরে গিয়ে সামাজিকভাবে সামাজিক প্রক্রিয়ায় শিল্পের অবস্থান তৈরি করতে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় ২০১৫সালের ৯ ডিসেম্বরের দুপুরে কলকাতায়।
সঙ্গের ছবিগুলি সবই শিল্পী সঞ্চয়ন ঘোষের ইনস্টলেশনের আলোকচিত্র।